بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর ২৮ জুন, ২০২৪ মোতাবেক ২৮ এহসান, ১৪০৩ হিজরী শামসী'র জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

বনু নযীরের সাথে যুদ্ধের উল্লেখ করা হচ্ছিল। এ সম্পর্কে আরও বিশদ বিবরণ যা হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) সীরাত খাতামান্ নবীঈন (পুস্তকে) লিখেছেন তা হলো,

'মহানবী (সা.) যখন বনু নযীরের একটি দুর্গ অভিমুখে যাত্রা করেন তখন তিনি তাঁর অবর্তমানে মদীনার বসতিতে ইবনে মাকতুম (রা.)-কে নামাযের ইমাম নিযুক্ত করেন আর স্বয়ং সাহাবীদের একটি দলের সাথে মদীনা থেকে বের হয়ে বনু নযীরের বসতি অবরোধ করেন আর সে যুগের রণরীতি অনুযায়ী বনু নযীর দুর্গে আবদ্ধ হয়ে যায়। সম্ভবত তখনই আব্দুল্লাহ্ বিন উবাই বিন সলূল এবং মদীনার অন্যান্য মুনাফিকরা বনু নযীরের নেতাদেরকে এ সংবাদ পাঠিয়েছিল যে, তোমরা মুসলমানদের কাছে কিছুতেই নতি স্বীকার করবে না; আমরা তোমাদের সাহায্য করব এবং তোমাদের পক্ষ থেকে লড়াই করব। কিন্তু বাস্তবে যখন যুদ্ধ আরম্ভ হয় তখন বনু নযীরের প্রত্যাশার বিপরীতে এসব মুনাফিকরা আর প্রকাশ্যে মহানবী (সা.)-এর বিপক্ষে যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবার সাহস পায় নি। আর বনু কুরায়যাও মুসলমানদের বিরুদ্ধে প্রকাশ্যে যুদ্ধক্ষেত্রে এসে বনু নযীরকে সাহায্য করার সাহস করে নি। যদিও মনের দিক থেকে তারা তাদের সাথে ছিল আর সংগোপনে তাদের সাহায্যও করত, যা মুসলমানরা জেনে গিয়েছিল। যাহোক, বনু নযীর উন্মুক্ত প্রান্তরে মুসলমানদের মোকাবিলা করার জন্য বের হয় নি, বরং দুর্গাবদ্ধ হয়ে বসে থাকে; কিন্তু সেই যুগের নিরিখে তাদের দুর্গ যেহেতু খুবই সুরক্ষিত ছিল, তাই তারা নিশ্চিন্ত ছিল যে; মুসলমানরা তাদের কোনো ক্ষতিসাধন করতে পারবে না আর অবশেষে মুসলমানরা স্বয়ং বিরক্ত হয়ে অবরোধ তুলে নেবে। আর এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, সেই যুগের অবস্থানুসারে এ ধরনের দুর্গ জয় করা সত্যিই অনেক কঠিন ও কষ্টসাধ্য একটি কাজ ছিল এবং এক দীর্ঘ সময়ব্যাপী অবরোধের দাবি রাখত।

যাহোক, মহানবী (সা.) সেখানে যান। তিনি (সা.) বনু নযীরের (দুর্গ) অবরোধ অব্যাহত রাখেন। এ অবরোধ ছয় দিন এবং আরেক রেওয়ায়েত অনুসারে পনেরো দিন পর্যন্ত (বহাল) থাকে। এছাড়া বিশ এবং তেইশ দিনের ভাষ্যও বর্ণিত হয়েছে। লোকেরা একথাও বলেছে যে, বিশ বা তেইশ দিন (অবরোধ) ছিল। অবরোধকালে মহানবী (সা.) কয়েকটি গাছ কাটার ও পুড়িয়ে ফেলার নির্দেশ দেন, কেননা ইহুদীরা যেহেতু দুর্গের প্রাচীর থেকে তির ও পাথর নিক্ষেপ করছিল এবং এসব গাছ তাদের জন্য প্রতিরক্ষার ভূমিকা পালন করত আর তাদের ঘাঁটি হিসেবে কাজ করছিল। (অর্থাৎ) এসব গাছ লুকানোর স্থানে পরিণত হচ্ছিল। তাই মহানবী (সা.) আবু লায়লা মা'যনী (রা.) এবং আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম (রা.)-র ওপর সেসব গাছ পুড়িয়ে ফেলার দায়িত্ব অর্পণ করেন। এটি যুদ্ধের কিংবা প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে করা হয়েছিল, বাগান ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে নয়; কেননা ইসলামে (অযথা) বৃক্ষরাজি কাটা নিষিদ্ধ। এরপর লেখা আছে, আবু লায়লা মা'যনী (রা.) তাদের আজওয়া খেজুরের গাছগুলোতে আগুন লাগাচ্ছিলেন আর আব্দুল্লাহ বিন সালাম (রা.)

আজওয়া ব্যতীত অন্যান্য খেজুরের গাছ পোড়াচ্ছিলেন। কিন্তু রেওয়ায়েতে এটিও আছে, নিম্নজাতের খেজুরের গাছগুলো পোড়ানো হয়েছিল। আমি এর বিস্তারিত বর্ণনা করব। যাহোক, এই রেওয়ায়েতে যা লেখা আছে তা হলো, হযরত আবু লায়লা (রা.) বলেন, এই গাছগুলো তাদের মূল্যবান সম্পদ। এগুলো পোড়ালে তারা অনেক বেশি দুঃখ পাবে। ইহুদীদের অনেক কষ্ট হবে, কেননা এগুলো তাদের মূলধন। হযরত আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম (রা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা তাদের ধনসম্পদ মহানবী (সা.)-এর জন্য মালে গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বানাবেন। আব্দুল্লাহ্ বিন সালাম (রা.)-র এই বাক্য থেকেও এটি স্পষ্ট হয় যে, আজওয়া খেজুরের গাছ যা অনেক মূল্যবান গাছ সেগুলো পোড়ানো হয় নি। অন্যান্য গাছ পোড়ানো হয়েছিল। তিনি (রা.) বলেন, আজওয়া সবচেয়ে উত্তম সম্পদ। তিনি (রা.) আরও বলেন, এগুলো মহানবী (সা.)-এর কাজে আসবে। ইহুদীরা যখন এই গাছগুলোকে আগুনে পুড়তে দেখে তখন তাদের মহিলারা বুক চাপড়াতে থাকে, মুখে চপেটাঘাত করতে থাকে এবং আহাজারি করতে থাকে। এরপর ইহুদীরা তৎক্ষণাৎ সংবাদ প্রেরণ করে যে, হে মুহাম্মদ (সা.)! আপনি তো অনেক সম্মানিত ও মর্যাদার অধিকারী। আপনি নৈরাজ্য সৃষ্টি করতে বারণ করেন এবং কোনো অবস্থাতেই বিশৃঙ্খলা পছন্দ করেন না। (অথচ) এখন আপনি নিজেই এ কাজ করছেন? কিন্তু যেমনটি বর্ণনা করা হয়েছে, এই গাছগুলো তাদের জন্য লুকোনোর স্থান ও প্রতিরক্ষার কাজ করছিল। তাই তাদের এই প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা গুঁড়িয়ে দেওয়া আবশ্যক ছিল। এর মাঝে এই প্রজ্ঞাও নিহিত ছিল যে, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব তাদের এই শক্তি নির্মূল হোক যেন আরও বেশি রক্তপাত না হয়। এছাড়া মনে হচ্ছে, আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ এলহামের আলোকে তিনি (সা.) এই গাছ পোড়ানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন। যেমনটি ইহুদীদের এই আপত্তির উত্তর আল্লাহ্ তা'লা এভাবে দিয়েছেন যে, **مَا قَطَعْتُم مِّن لِّينَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا قَائِمَةً عَلَىٰ أُصُولِهَا فَبِإِذْنِ اللَّهِ وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ** (সূরা আল-হাশরঃ ৬) অর্থাৎ, **তোমরা যে খেজুর গাছই কেটেছ বা তাকে তার মূলের ওপর দণ্ডায়মান ছেড়ে দিয়েছ, বস্তুত তা ছিল আল্লাহ্র আদেশে এবং এজন্য ছিল, যেন তিনি দুষ্কৃতকারীদের লাঞ্ছিত করেন ।**

কোনো কোনো রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) অবরোধের সময় ইহুদীদেরকে পুনরায় এক দফা ক্ষমা করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করে নতুনভাবে চুক্তি সম্পাদনের প্রস্তাবও দিয়েছিলেন। অতএব তিনি (সা.) ইহুদীদেরকে বলেন, **إِنَّكم واللهِ لا تأْمَنونَ عندي إلّا بعَهْدٍ تعاهدوني عليه** (উচ্চারণ: **'ইন্নাকুম ওয়াল্লাহি লা তা'মানূনা ইনদী ইল্লা বিআহ্দিন তুয়াহিদুনী আলাইহি'**) অর্থাৎ, তোমাদের ওপর আমার কোনো আস্থা নাই; এতদ্ব্যতীত যে, তোমরা আমার সাথে নতুনভাবে কোনো দৃঢ় চুক্তি সম্পাদন করো। কিন্তু তারা চুক্তি করতে অস্বীকার করে। ইহুদীরা সবচেয়ে বেশি ধনসম্পদের লোভী হয়ে থাকে। তাদের মূল্যবান গাছ যখন পোড়ানো হয় তখন তারা সঙ্গে সঙ্গে নতজানু হয়ে এলাকা ছাড়তে সম্মত হয়ে যায়।

আমি (উপরোক্ত) বিবরণ একটি জীবনীগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত করেছি। এখন হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)-র যে জীবনীগ্রন্থ আছে তার বরাতে উল্লেখ করছি। (এ সম্পর্কে তিনি) লিখেছেন, বেশ কিছুদিন পর্যন্ত মুসলমানরা লাগাতার অবরোধ করে রাখে কিন্তু কোনো লাভ হচ্ছিল না। অবরোধের কয়েক দিন অতিবাহিত হবার পরও যখন কোনো কাজ হচ্ছিল না এবং বনু নযীর রীতিমতো প্রতিরোধে অবিচল থাকে তখন মহানবী (সা.) আদেশ প্রদান করেন, দুর্গের বাহিরে

থাকা বনু নযীরের এসব খেজুর গাছগুলোর মধ্য হতে কিছু গাছ কেটে ফেলা হোক। যে গাছগুলো কাটা হয়েছে সেগুলো 'লীনা' জাতের খেজুর গাছ ছিল, যা নিম্নজাতের খেজুর ছিল। যার ফল সাধারণত মানুষের খাবার হিসেবে ব্যবহৃত হতো না। আর এই নির্দেশের পেছনে অভিপ্রায় ছিল, যেন এই গাছগুলোকে কর্তিত হতে দেখে বনু নযীর গোত্র ভীতত্রস্ত হয় এবং নিজেদের দুর্গের ফটক খুলে দেয়। আর এভাবে কিছু গাছের ক্ষতির মাধ্যমে অনেক মানুষের প্রাণনাশের ক্ষতি এবং দেশের নৈরাজ্য ও বিশৃঙ্খলা রোধ হয়। অতএব, এই পরিকল্পনা ফলপ্রসূ হয়। মাত্র ছয়টি গাছই কাটা হয়েছিল; এরই মধ্যে বনু নযীর সম্ভবত এই ধারণা করে যে, হয়ত মুসলমানরা তাদের সব গাছ কেটে ফেলবে যার মধ্যে ফলবান গাছও ছিল; তারা হা-হুতাশ করতে আরম্ভ করে। অথচ পবিত্র কুরআনে যেমনটি ব্যাখ্যা করা হয়েছে, শুধুমাত্র কয়েকটি গাছ আর তা-ও লীনা জাতের (খেজুর) গাছ কাটার অনুমতি ছিল এবং অন্যান্য গাছ সুরক্ষার নির্দেশ দেওয়া ছিল। আর এমনিতে সাধারণ অবস্থায়ও মুসলমানদের জন্য শত্রুদের ফলবান বৃক্ষ কর্তনের অনুমতি ছিল না। যাহোক, এই কৌশল কার্যকর হয় আর বনু নযীর ভীত হয়ে পনেরো দিনের অবরোধের পর এই শর্তে দুর্গের দ্বার খুলে দেয় যে, আমাদের এখান থেকে নিজেদের সাজসরঞ্জাম নিয়ে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে যেতে দেওয়া হোক। এটি সেই শর্তই ছিল যা মহানবী (সা.) স্বয়ং প্রথমে উপস্থাপন করেছিলেন। আর যেহেতু তাঁর (সা.) নিয়্যত ছিল কেবল শান্তি প্রতিষ্ঠা করা, তাই তিনি (সা.) মুসলমানদের এই কষ্ট এবং সেসব ব্যয়কে উপেক্ষা করেন, যা এই অভিযানে তাদের স্বীকার করতে হয়েছিল। এখনও [তিনি (সা.)] বনু নযীর-এর এই শর্ত মেনে নেন আর হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-কে দায়িত্ব দেন, তিনি যেন নিজের তত্ত্বাবধানে বনু নযীর গোত্রকে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে মদীনা থেকে বিদায় করেন।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.) যেমনটি লিখেছেন যে, উন্নত মানের খেজুর গাছ কাটা হয় নি। অনুরূপভাবে বুখারীরও একটি ব্যাখ্যাপুস্তকে একথা লেখা হয়েছে, যার রেওয়ায়েত হলো এই যে, অর্থাৎ তার বিস্তারিত বর্ণনায় লেখা আছে যে, রেওয়ায়েত সমূহের বিস্তারিত বর্ণনায় দৃষ্টি দিলে দেখা যায়, প্রথমত যে-সব খেজুর গাছ জ্বালানো হয়েছিল সেগুলো উন্নত মানের খেজুর ছিল না, বরং সাধারণ ও অকেজো ধরনের খেজুর ছিল যা সাধারণত মানুষের খাদ্য হিসেবেও ব্যবহৃত হতো না। অধিকন্তু কেবল ছয়টি বৃক্ষ জ্বালানো হয়েছিল, যেমনটি সীরাত খাতামান নবীঈন পুস্তকেও বর্ণিত হয়েছে।

ইহুদীদের নিরুপায় হওয়া এবং তাদের স্বয়ং দেশান্তরের প্রার্থনা সম্পর্কে আরও বিস্তারিত এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, মুসলমানরা উক্ত গোত্রের ইহুদীদের গাছ পুড়িয়ে তাদেরকে আরও অস্বস্তিতে ফেলে দেয়। আল্লাহ্ তা'লা তাদের হৃদয়ে ভীতির সঞ্চার করেন। তাদের উদ্যম হারিয়ে যায় আর তারা অস্ত্র সমর্পণে প্রস্তুত হয়ে যায়। তারা আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)-কে বলে পাঠায় যে, আমরা মদীনা থেকে বেরিয়ে যেতে প্রস্তুত আছি। আপনি আমাদেরকে শান্তিপূর্ণ দেশান্তরের সুযোগ দিন। তিনি (সা.) তাদের আবেদন মঞ্জুর করেন আর নির্দেশ দেন যে, মদীনা থেকে বেরিয়ে গেলে তোমাদের প্রাণ সুরক্ষিত থাকবে। তোমাদের উট যেসব আসবাবপত্র বহন করতে পারে তা-ও নিয়ে যাও, অস্ত্র ব্যতিরেকে। ইসলাম ও মহানবী (সা.)-এর ওপর যুদ্ধ এবং হত্যা ও লুটপাট, যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সংগ্রহ ইত্যাদি বিষয়ে আপত্তিকারীদের দেখা উচিত যে, এখন মহানবী (সা.) উক্ত ইহুদীদের ওপর কর্তৃত্ব অর্জন করা সত্ত্বেও আর ইহুদীও তারা যারা কিনা অনবরত চুক্তিভঙ্গ করে গিয়েছে, সে-সব লোক যারা বেশ কয়েকবার মহানবী (সা.)-কে, যিনি কিনা মদীনা রাষ্ট্রের শাসকও

ছিলেন, তাঁকে হত্যা করার হীন ষড়যন্ত্র ও চেষ্টাও করেছিল আর একসময় অস্ত্রসজ্জিত হয়ে রীতিমতো বিদ্রোহ আরম্ভ করেছিল আর উক্ত অবরোধকালেও একবার তিনি (সা.) নতুনভাবে চুক্তি ও সন্ধির প্রস্তাব দিলে একান্ত দম্ভভরে তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছিল আর এখন অবশেষে যখন মহানবী (সা.) তাদের ওপর নিজ কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করেন তখন তাদেরকে যত কঠোর শাস্তিই দেওয়া হোক না কেন তা বৈধ হতো, কিন্তু মহানবী (সা.)-এর শান্তিপ্রিয়তা ও আপসকামিতা এবং মানুষের প্রতি দয়া ও স্নেহের অদ্ভুত মাহাত্ম্য ও প্রকৃতি এখানে প্রকাশ পায় যে, তিনি (সা.) তাদেরকে এখান থেকে শান্তি ও নিরাপত্তার সাথে চলে যাওয়ার অনুমতি প্রদান করেন। অধিকন্তু দয়া ও উদারতার অবস্থা এই ছিল যে, একইসাথে এই অনুমতিও প্রদান করেন যে, অস্ত্র ও হাতিয়ার ব্যতিরেকে যে আসবাবপত্র ইচ্ছা নিয়ে যেতে পারো। অতএব, পরবর্তীতে বিস্তারিত বর্ণনা করা হবে যে, ইহুদীরা এই ক্ষমা ও দানকে এমনভাবে কাজে লাগায় যে, নিজেদের ঘরের দরজা পর্যন্ত খুলে নিয়ে ছয়শ' উটের ওপর আসবাবপত্র বোঝাই করে নিয়ে যায়। আর নিজেদের চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ এভাবে করে যে, যেসব জিনিস সাথে নিয়ে যেতে পারছিল না সেগুলো নষ্ট করার পূর্ণ চেষ্টা করে। অতএব, তারা নিজেদের বাড়িঘরের ছাদ ও দেয়ালগুলোকে ভূপাতিত করে দেয় যেন তা মুসলমানদের কাজে না আসে। অর্থাৎ ঘরবাড়িও ভেঙে দিয়ে যায়।

দেশান্তরের জন্য অর্থাৎ বনু নযীর গোত্রের নির্বাসনের যেসব শর্ত নিরূপণ করা হয়েছিল, সেসব শর্তের প্রেক্ষিতে এই বিষয়গুলোর উল্লেখ পাওয়া যায়।

১. বনু নযীর গোত্রের ইহুদীরা মদীনা মুনাওয়ারা থেকে যেখানে ইচ্ছা যেতে পারবে। এটি হলো প্রথম কথা। তারা অর্থাৎ বনু নযীর গোত্রের লোকেরা মদীনা ছেড়ে যাবে, বাকি যেখানে খুশি চলে যাক। অর্থাৎ যেখানে যেতে চায় যেতে পারে। ইহুদীরা মদীনা মুনাওয়ারা থেকে দেশান্তরিত হবার সময় সম্পূর্ণরূপে নিরস্ত্র থাকবে। অস্ত্র ব্যতিরেকে ইহুদীরা তাদের ধনসম্পদ যতটা নিজেদের উটে করে নিয়ে যেতে পারে নিয়ে যাবে। ৪. ইহুদীদের সামর্থ্য অনুযায়ী সম্পদ নিয়ে যাওয়ার পর তাদের স্থাবর-অস্থাবর যেসব সম্পদ রয়ে যাবে সেগুলোতে মুসলমানদের মালিকানা হবে। দেশান্তরের কাজের তদারকি এবং ইহুদীদের ওজর ও বাহানা করা সম্পর্কেও বর্ণনা রয়েছে। এ সম্পর্কে লেখা আছে যে, বনু নযীরকে মদীনা মুনাওয়ারা থেকে বিতাড়িত করার দায়িত্ব হযরত মুহাম্মদ বিন মাসলামা (রা.)-র ওপর দেওয়া হয়। তখন ইহুদীরা আরেকটি ওজর এটি করে যে, এখানকার অনেক লোক আমাদের কাছে ঋণী; নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষে তারা সেই ঋণ পরিশোধ করবে। সেগুলোর কী হবে? তাদের উদ্দেশ্য ছিল, এভাবে যেন মদীনায় থাকার আরও সুযোগ তাদের লাভ হয়। মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা সুদ ছেড়ে দিয়ে ঋণের অর্থ কমিয়ে দাও এবং দ্রুত করো। অর্থাৎ ঠিক আছে, ঋণ তোমরা ফেরত পাবে; তবে শর্ত হলো তোমাদেরকে সুদ মাফ করে দিতে হবে। কিন্তু এখান থেকে দ্রুত বের হয়ে যাও।

আবু রাফে' সালাম বিন আবি হুকায়েক, হযরত উসায়েদ বিন হুযায়ের (রা.)-র কাছে ১২০ দিনার পেতো। অতএব, তিনি চল্লিশ দিনারের সুদ মাফ করে দিয়ে মূল অর্থ আশি দিনার গ্রহণ করে। অনুরূপ আরও অনেক লোক থাকবে।

মহানবী (সা.) যখন দেশান্তরের শর্ত আরোপ করেন তখন আবু রাফে' সালাম বিন আবি হুকায়েক, হুয়ী বিন আখতাবকে বলে, তোমার মন্দ হোক, এর চেয়েও মন্দ পরিণামের সম্মুখীন হওয়ার পূর্বেই ইসলাম গ্রহণ করে নাও। হুয়ী বলে, এর চেয়ে মন্দ পরিণাম আর কী হতে পারে? আবু রাফে' বলে, আমাদের সন্তানদের বন্দি করা হবে, আমাদের যোদ্ধারা নিহত হবে আর

আমাদের ধনসম্পদ মুসলমানদের করায়ত্তে চলে যাবে। আর সম্পদ ছেড়ে দিয়ে প্রাণ রক্ষা করা সহজ। যদি আমরা কোনো নৈরাজ্য সৃষ্টি করি তাহলে এর পরিণাম হবে মৃত্যু ও বন্দি হওয়া। হুয়ী দুএকদিন এই সিদ্ধান্তের বিষয়ে চিন্তাভাবনা করতে থাকে। যখন ইয়ামিন বিন উমায়ের এবং আবু সা'দ বিন ওহাব তার এই দ্বিধান্বিত অবস্থা দেখে তখন তাদের একজন অপরজনকে বলে, নিঃসন্দেহে তোমার জানা আছে যে, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্‌র রসূল। অতএব, তুমি কীসের অপেক্ষা করছো? আমাদের ইসলাম গ্রহণ করা উচিত। আমাদের তো জানা আছে আর আমাদের কিতাব থেকেও এটি প্রমাণিত হয়। তাই আমাদের ইসলাম গ্রহণই উত্তম হবে। এভাবে আমাদের সম্পদ ও প্রাণ সুরক্ষিত হয়ে যাবে। অতএব, তারা রাতের অন্ধকারে নিজেদের দুর্গ থেকে বের হয় আর মুসলিম বাহিনীর কাছে আসে। তারা ইসলাম গ্রহণ করে নিজেদের প্রাণ ও সম্পদ সুরক্ষিত করে নেয়। এভাবে এই দুজন মুসলমান হয়ে যায়। ইয়ামিন বিন উমায়ের পরবর্তীতে অনেক নিষ্ঠাবান সাহাবী প্রমাণিত হন। বরং তার হৃদয়ে সেই দিনগুলোতেই মহানবী (সা.)-এর প্রতি এতটা ভালোবাসা সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল যে, বনু নযীর গোত্রের যেই ইহুদী আমর বিন জাহাশ মহানবী (সা.)-কে হত্যা করার ঘৃণ্য চেষ্টা করেছিল, সে উক্ত ইসলাম গ্রহণকারী ইয়ামিন বিন উমায়ের (রা.)-রই চাচাতো ভাই ছিল। অতএব, এই নিষ্ঠাবান নবমুসলিম এক ব্যক্তির দ্বারা আমর বিন জাহাশকে হত্যা করান। মহানবী (সা.) যখন তার এই নিষ্ঠা ও ভালোবাসার কথা জানতে পারেন তখন তিনি আনন্দিত হন। এটি ইতিহাসের একটি গ্রন্থের উদ্ধৃতি। ইহুদীদের দেশান্তরের অবস্থা সম্পর্কে লেখা আছে যে, ইহুদীরা দেশান্তরিত হবার সময় তাদের উটের ওপর নারী ও শিশুদের ছাড়া নিজেদের সেসব আসবাবপত্রও বোঝাই করে নেয় যা উট নিয়ে যেতে পারতো, শুধু অস্ত্র ছেড়ে দেয়। তাদের সাথে মোট ছয়শ' উট ছিল। প্রত্যেকে নিজ নিজ বাড়ি ভেঙে ফেলে এর কাঠের দরজা, জানালা ইত্যাদি উটে বোঝাই করে নিয়ে যায়। একটি রেওয়ায়েতে আছে, তারা নিজেদের বাড়ির খুঁটি এবং ছাদও ভেঙে ফেলে। দরজার ফ্রেম, ডাসা এমনকি দরজার খিল এবং চৌকাঠ পর্যন্ত খুলে নিয়ে যায়। আর শুধুমাত্র হিংসা ও আক্রোশের বশে (তারা) নিজেদের বাড়িঘরের দেয়াল পর্যন্ত ধ্বসিয়ে দেয় যেন তাদের নির্বাসনের পর সেগুলো মুসলমানদের ব্যবহারযোগ্য না থাকে। ইহুদীরা যখন তাদের সন্তানসন্ততি এবং নারীদের যাত্রীবাহী উটের ওপর আরোহণ করায় এবং অন্যান্য (মালবাহী) উটের ওপর মালামাল বোঝাই করতে থাকে, তখন তাদের আচারআচরণ দেখে মনে হচ্ছিল, তাদের মাঝে নির্বাসনের কারণে কোনো দুশ্চিন্তা বা অনুশোচনা নেই। অথচ তাদের অন্তর (হিংসার) আগুনে জ্বলছিল। হৃদয় জ্বলেপুড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু ভাব দেখাচ্ছিল যেন তাদের কোনো ভ্রুক্ষেপ নেই। মোটের ওপর লোকদের এটি বুঝাতে চাচ্ছিল যে, আমরা সানন্দে এখান থেকে চলে যাচ্ছি। এরা প্রথমে বনু হারেস বিন খাযরাজ-এর এলাকা অতিক্রম করে, জিসর অতিক্রম করে, এরপর মদীনা মুনাওয়ারার বাজার দিয়ে তারা অতিক্রম করে। (জিসর হলো মদীনার একটি বাজারের নাম।) যাহোক, তারা তাদের নারীদের সাজিয়ে-গুজিয়ে উটের হাওদায় বসিয়ে রেখেছিল। (তাদেরকে) উটের ওপর বসিয়ে দিয়েছিল আর একইসাথে গানবাজনার তালে তালে তাদের নর্তকিরা নৃত্যও করছিল। এরা সবার সামনে নিজেদের ধনসম্পদ ও প্রাচুর্য প্রদর্শন করছিল যেন মানুষ তাদের প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়। আবু রাফে' চামড়ার তৈরি একটি থলে সোনা–রূপায় ভরে রেখেছিল। সেটিকে উঁচিয়ে তুলে ধরে বলছিল, আমরা এই অর্থ এহেন পরিস্থিতি মোকাবিলা করার এবং বিজয়লাভের জন্য রেখেছিলাম! তাদের যাত্রার দৃশ্য এমন ছিল– গান গাচ্ছিল, সানাই বাজছিল, উত্তেজক পঙ্‌ক্তি পাঠ করছিল এবং নৃত্য-গীত করছিল। পক্ষান্তরে মহানবী (সা.) তাদের

হীনতা উপেক্ষা করেন। এসব দেখা সত্ত্বেও তাদের প্রতি কোনো মনোযোগ দেন নি। তারা যদি অন্য কোনো জাতির মুখোমুখি হতো তাহলে হয়ত শরীর ঢাকার মতো কোনো কাপড়ও তাদেরকে দেয়া হতো না। যে পরিস্থিতি তারা সৃষ্টি করেছিল এবং তারা যে আচরণ প্রদর্শন করেছিল তাতে তাদের এমন শাস্তি পাওয়া উচিত ছিল যে, কিছুই নিয়ে যেতে দেওয়া হতো না। কিন্তু মহানবী (সা.) স্বীয় মার্জনা এবং করুণার কারণে এসব বিষয়ের প্রতি কোনো ভ্রুক্ষেপই করেন নি।

বনু নযীরের নতুন ঠিকানা কোথায় হয়েছিল– এ সম্পর্কে লেখা আছে, বনু নযীর যখন দেশান্তরের নির্দেশ পায় তখন তাদের জন্য সমগ্র আরব উপদ্বীপ ত্যাগ করার প্রয়োজন ছিল না বরং কেবল মদীনা মুনাওয়ারা ত্যাগ করা আবশ্যক ছিল। শুধুমাত্র মদীনা থেকে বহিষ্কার করা হয়েছিল, এছাড়া যেখানে ইচ্ছা বসতি স্থাপন করতে পারতো। অতএব, তাদের মধ্য হতে কিছু সিরিয়ার আযরিয়াত অঞ্চলের দিকে চলে যায় এবং অধিকাংশ খায়বার অভিমুখে যায়। খায়বার, মদীনা মুনাওয়ারা থেকে প্রায় ৯৬ মাইল দূরে অবস্থিত। এটি আরব উপদ্বীপে বসতি স্থাপনকারী ইহুদীদের এত বড়ো কেন্দ্র ছিল যে, এখানে সশস্ত্র যোদ্ধার সংখ্যাই ছিল দশ হাজার। এছাড়া ইহুদীদের অনেক দুর্গও সেখানে ছিল এবং এই অঞ্চলটি কৃষিসম্পদে সমৃদ্ধ ছিল। আরব উপদ্বীপের সকল ইহুদী বনু নযীরের কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বে বিশ্বাসী ছিল, কেননা এরা নিজেদেরকে হযরত হারূন (আ.)-এর বংশধর বলে দাবি করত। এছাড়া বনু নযীরের এই লোকেরা সম্পদশালী হওয়ার পাশাপাশি ভীষণ ধূর্ত ও চতুর ছিল। কাজেই, বনু নযীরের লোকেরা যখন খায়বারে চলে যায় তখন সেখানে ইহুদীদের শক্তি ও ক্ষমতা আরও বেড়ে যায়। তাদের মাঝে বনু নযীরের জ্যেষ্ঠ হুয়ী বিন আখতাব, সালাম বিন আবিল হুকায়েক এবং কিনানা বিন রবী'র মতো লোকেরাও ছিল। খায়বারের ইহুদীরা রণনৈপুণ্য ও দক্ষতায় অনন্য ও সেরা ছিল (অর্থাৎ খায়বারের লোকেরা যুদ্ধের দিক দিয়ে ভীষণ দক্ষ ছিল;) কিন্তু বনু নযীরের ইহুদীরা যুদ্ধের চেয়ে রাজনৈতিক দূরদর্শিতায় অগ্রগামী ছিল। রাজনীতির দিক দিয়ে বনু নযীরের অধিবাসীরা অনেক বিচক্ষণ ছিল। খায়বারে পা রাখতেই তারা অর্থাৎ, বনু নযীরের লোকেরা খুব সহজেই নিজেদেরকে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্বের আসনে অধিষ্ঠিত করে আর এর ফলে খায়বার মুসলমানদের জন্য একটি প্রধান রণাঙ্গনে পরিণত হয়।

বনু নযীরের ইহুদীদের সাথে আনসার পুত্রদের যাবার ব্যাপারে বর্ণিত হয়েছে, বনু নযীরের কিছু মানুষ মদীনা থেকে নির্বাসিত হয়ে সিরিয়ার আযরিয়াত অঞ্চল অভিমুখে চলে যায়। সেসব ইহুদীর মাঝে কয়েকজন মুসলমান আনসারের পুত্রও ছিল। এর কারণ হলো, ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তাদের এই রীতি ছিল, যদি কোনো আনসার নারীর সন্তান জীবিত না থাকত তাহলে সেই নারী এ মানত করত, যদি তার পুত্র বেঁচে থাকে তাহলে সে তাকে ইহুদী বানিয়ে দেবে। অতএব, এমন অনেক মানুষ ছিল আনসারের পুত্র হওয়া সত্ত্বেও যাদেরকে ইহুদী বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যখন বনু নযীরের লোকেরা দেশান্তরিত হতে থাকে তখন সেসব পুত্রের পিতারা বলে, আমরা আমাদের সন্তানদেরকে তাদের সাথে যেতে দেবো না। তখন আল্লাহ্ তা'লা তাদের জন্য এই ওহী অবতীর্ণ করেন; সীরাতে হালাবিয়ায় একথা লেখা আছে যে, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ অর্থাৎ ধর্মে কোনো বলপ্রয়োগ নাই।

হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব (রা.)ও এ সম্পর্কে লিখেছেন, বনু নযীর অনেক ধুমধাম ও মহাসমারোহে নিজেদের সকল আসবাবপত্র এমনকি স্বয়ং নিজেদের হাতে নিজেদের ঘরবাড়ি ভেঙে এসবের দরজা, চৌকাঠ এবং কাঠ পর্যন্ত খুলে নিজেদের সাথে করে নিয়ে যায়। আরও লেখা

আছে, এরা মদীনা থেকে এমন উৎসবমুখর পরিবেশে ও জাঁকজমকের সাথে গানবাজনা করতে করতে যাত্রা করে যেভাবে একটি বরযাত্রী যাত্রা করে থাকে। যদিও তাদের যুদ্ধাস্ত্র এবং স্থাবর সম্পত্তি প্রভৃতি অর্থাৎ বাগান ইত্যাদি মুসলমানদের হস্তগত হয় আর যেহেতু কোনো প্রকার প্রথাগত যুদ্ধ ছাড়াই এই সম্পদ অর্জিত হয়েছিল তাই ইসলামী শরীয়ত অনুযায়ী এর বণ্টনের অধিকার একমাত্র মহানবী (সা.)-এর হাতেই ছিল। আর তিনি (সা.) এই সম্পদের অধিকাংশ দরিদ্র মুহাজিরদের মাঝে বণ্টন করে দেন যাদের জীবিকা নির্বাহের ভার তখনো পর্যন্ত সেই প্রারম্ভিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের অধীনে আনসারের সম্পদের ওপর নির্ভরশীল ছিল আর এভাবে পরোক্ষভাবে আনসারও সেই মালে গনিমতের অংশীদার হয়ে যায়।

মুহাম্মদ বিন মাসলামা সাহাবীর তত্ত্বাবধানে বনু নযীর (গোত্র) যখন মদীনা থেকে বের হচ্ছিল তখন কতক আনসার সেসব লোকদেরকে তাদের সাথে যেতে বাধা দিতে চায় যারা প্রকৃতপক্ষে আনসারের সন্তান ছিল, কিন্তু আনসারের মানত পূরণ করতে গিয়ে তারা ইহুদী হয়ে গিয়েছিল আর বনু নযীর তাদেরকে নিজেদের সাথে করে নিয়ে যেতে চাচ্ছিল। আর আনসারের এই দাবি যেহেতু ইসলামী নির্দেশনা, لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ অর্থাৎ ধর্মের ক্ষেত্রে কোনো প্রকার বলপ্রয়োগ করা উচিত নয়– এর বিরুদ্ধে ছিল, তাই মহানবী (সা.) মুসলমানদের বিপক্ষে এবং ইহুদীদের অনুকূলে সিদ্ধান্ত প্রদান করেন এবং বলেন, যে ব্যক্তি ইহুদী এবং নির্বাসিত হতে চায় আমরা তাকে আটকাতে পারি না। তবে বনু নযীরের দুজন ব্যক্তি স্বয়ং নিজেদের ইচ্ছায় মুসলমান হয়ে মদীনায় থেকে যায়, যেমনটি পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে।

এক রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বনু নযীরের বিষয়ে এই সিদ্ধান্ত প্রদান করেছিলেন, তারা যেন সিরিয়া অভিমুখে চলে যায়, অর্থাৎ আরবে না থাকে। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তাদের কোনো কোনো নেতা, উদাহরণস্বরূপ সালাম বিন আবিল হুকায়েক, কিনানা বিন রবী' এবং হুয়ী বিন আখতাব প্রমুখ এবং আমজনতার একাংশও হিজাযের উত্তরে ইহুদীদের বিখ্যাত বসতি খায়বারে গিয়ে পুনর্বাসিত হয় আর খায়বারবাসীরাও তাদেরকে স্বাগত জানায় এবং আদর-আপ্যায়ন করে। অবশেষে এই লোকেরাই মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভয়ানক নৈরাজ্য সৃষ্টি ও যুদ্ধের প্ররোচনার কারণ হয়।

বনু নযীরের কাছ থেকে প্রাপ্ত সম্পদকে **'মালে ফ্যায়'** বলা হয়। এর বণ্টন কীভাবে হয়েছিল– এ সম্পর্কে লেখা আছে: বনু নযীর গোত্র নির্বাসিত হবার পর তাদের অস্ত্রশস্ত্র, বাগান, জায়গাজমি এবং বাড়িঘর মহানবী (সা.) হস্তগত করেন। অস্ত্রশস্ত্রের মধ্যে ছিল ৫০টি শিরস্ত্রাণ, ২৫টি বর্ম এবং ৩৪০টি তরবারি। এটি ছিল মুসলমানদের অর্জিত প্রথম মালে ফ্যায়। মালে ফ্যায় এমন সম্পদকে বলা হয় যা কোনোরূপ যুদ্ধ ছাড়া কাফিরদের কাছ থেকে অর্জিত হয়। এই (মালে ফ্যায়) থেকে মালে গনিমতের ন্যায় খুমুস (তথা এক-পঞ্চমাংশ) পৃথক করা হয় না, বরং সমস্ত সম্পদ মহানবী (সা.)-এর অধীনে থাকত যাতে মহানবী (সা.) যেখানে খুশি তা ব্যয় করতে পারেন।

বনু নযীরের সাথে যুদ্ধ করার কোনো প্রয়োজনই পড়ে নি। বরং আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নবীর প্রতাপ ও প্রভাব তাদের হৃদয়ে বিস্তার করে দিয়েছিলেন। এভাবে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর রসূলকে তাদের সম্পদের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিয়েছিলেন। এই সম্পদ ছিল মালে ফ্যায়। মহানবী (সা.)

তাদের সকল সহায়-সম্পদ মুসলমানদের মাঝে বিতরণ করে দেন যেন তারা সেগুলো পুণ্যকর্মে ব্যয় করতে পারে। এ বিষয়ে আল্লাহ্ তা'লা বলেন:

وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلٍ وَلَا رِكَابٍ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يُسَلِّطُ رُسُلَهُ عَلَىٰ مَنْ يَشَاءُ ۚ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ (সূরা আল-হাশর: ০৭)

অর্থাৎ আর আল্লাহ্ তা'লা তাদের ধনসম্পদের মধ্য থেকে নিজ রসূলকে গনিমত হিসেবে যা দান করেছেন তার জন্য তোমরা ঘোড়া এবং উট দৌড়াওনি, কিন্তু আল্লাহ্ নিজ রসূলগণকে যার ওপর চান, আধিপত্য দান করেন [অর্থাৎ কোনো যুদ্ধ হয় নি] এবং আল্লাহ্ সকল বিষয়ে, যা তিনি চান, সর্বশক্তিমান।

আনসারের অদ্ভুত ঈর্ষণীয় ভালোবাসা এবং আত্মত্যাগের দৃষ্টান্তও এখানে আমরা দেখতে পাই। মহানবী (সা.) এই মালে ফ্যায় বিতরণ করার সময় হযরত সাবেত বিন কায়েস বিন শামাস (রা.)-কে বলেন, আমার সামনে তোমার জাতিকে একত্রিত করো। তিনি (রা.) জিজ্ঞেস করেন, হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! খাযরাজ গোত্রের লোক? তিনি (সা.) বলেন, সকল আনসারকে ডেকে আনো। তখন তিনি (রা.) তাঁর সম্মুখে অওস এবং খাযরাজ গোত্রের সকল আনসারকে ডেকে আনেন। মহানবী (সা.) আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণকীর্তন করার পর মুহাজিরদের সাথে আনসারের উত্তম আচরণের উল্লেখ করতে গিয়ে বলেন, [অর্থাৎ মুহাজিরদের সাথে আনসার যে উত্তম আচরণ করেছিল– এর উল্লেখ করেন] আর বলেন, যদি তোমরা চাও [অর্থাৎ আনসারের উদ্দেশ্যে বলেন,] যদি তোমরা চাও তাহলে বনু নযীরের কাছ থেকে অর্জিত মালে ফ্যায় তোমাদের এবং মুহাজিরদের মাঝে বিতরণ করা হবে। এমতাবস্থায় মুহাজিরদের তোমাদের ঘরের দখল বহাল থাকবে এবং তারা তোমাদের সম্পদের অধিকারী থাকবে। আর তোমরা সম্মতি দিলে আমি মালে ফ্যায় মুহাজিরদের মাঝে বিতরণ করতে চাই। এর ফলে তারা তোমাদের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত বাড়িঘর থেকে বের হয়ে যাবে। [অর্থাৎ তারা নিজেদের মধ্যে যে সম্পদ ভাগাভাগি করে নিয়েছিল এবং মুহাজিররা আনসারের সম্পত্তি থেকে যে উপকার লাভ করছিল তা বন্ধ হয়ে যাবে। কেননা তখন তাদের কাছে সহায়-সম্পদ থাকবে।] এই কথার প্রেক্ষিতে হযরত সা'দ বিন উবাদা ও হযরত সা'দ বিন মুআয (রা.) নিবেদন করেন, আমাদের সম্পত্তিও তাদের কাছে থাকুক এবং বনু নযীরের কাছ থেকে প্রাপ্ত সমস্ত সম্পদও আমাদের মুহাজির ভাইদের মাঝে বিতরণ করে দিন। [অর্থাৎ আমরা তাদেরকে যে সম্পদ দিয়ে রেখেছি সেটা তাদের কাছে থাকুক এবং বনু নযীর থেকে প্রাপ্ত মালে ফ্যায়ও তাদেরকে দিয়ে দিন।] মুহাজিররা চতুর্দিক থেকে আনসারের এই আওয়াজ শুনতে পেল: **'রাযিনা ওয়া সাল্লামনা ইয়া রসূলাল্লাহ্!'** অর্থাৎ হে আল্লাহ্র রসূল (সা.)! আমরা এই সিদ্ধান্তে সন্তুষ্ট এবং আমরা এতে সম্মতি দিচ্ছি। মহানবী (সা.) ত্যাগের এই স্পৃহা দেখে খুবই প্রীত হন এবং বলেন, **'আল্লাহুম্মারহামিল আনসারা ওয়া আবনাআল আনসার'**, অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আনসার এবং তাদের সন্তানদের প্রতি অনুগ্রহ বর্ষণ করো। মহানবী (সা.) অধিকাংশ সম্পদ মুহাজিরদের মাঝে বিতরণ করে দেন। আনসারের মধ্য থেকে কেবল দুজন অভাবী সাহাবীকে উক্ত সম্পদের অংশবিশেষ দেওয়া হয় যারা ছিলেন যথাক্রমে হযরত সাহল বিন হুনায়েফ এবং হযরত আবু দুজানা (রা.)। ইবনে উয়ায়না বর্ণনা করেন, আমি যুহরীকে বলতে শুনেছি, মহানবী (সা.) বনু নযীরের সম্পদ থেকে হযরত সাহল বিন হুনায়েফ (রা.) এবং হযরত আবু দুজানা (রা.) ব্যতীত আনসারের মধ্য থেকে আর কাউকে এর অংশ দেন নি। এ দুজন সাহাবী যেহেতু অভাবী ছিলেন তাই তাদেরকে

(উক্ত সম্পদের) অংশ দেওয়া হয়। মহানবী (সা.) হযরত সা'দ বিন মু'আয (রা.)-কে আবু হুকায়েকের তরবারিটি প্রদান করেন। এই তরবারির বিশেষ খ্যাতি ছিল। মহানবী (সা.) অবশিষ্ট জিনিসপত্র দরিদ্রদের মাঝে বিতরণ করে দেন। আর কিছু নিজের জন্য রাখেন যা (তাঁর) পবিত্র সহধর্মিনীদের বিভিন্ন ব্যয় নির্বাহের জন্য ছিল। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বনু নযীরের এসব বাগান থেকে প্রাপ্ত শস্যাদির মধ্য থেকে এক বছরের ব্যয়ের সমপরিমাণ তাঁর স্ত্রীদের প্রদান করতেন। অর্থাৎ তাদের যে বার্ষিক ব্যয় ছিল তা নিজ স্ত্রীদের দিতেন। আর যা অবশিষ্ট থাকত তা জিহাদের প্রস্তুতির জন্য ব্যয় করতেন। দরিদ্র ও অসহায়দের সাহায্যও এই অর্থ থেকে করা হতো। বনু নযীরের সাতটি বাগান ছিল যেগুলো দেখাশোনার জন্য মুক্ত ক্রীতদাস হযরত আবু রাফে'কে দায়িত্ব প্রদান করা হয়। অর্থাৎ তিনি (বাগানগুলোর) ম্যানেজার ছিলেন। এসব বাগানের নাম ছিল যথাক্রমে- **মিস'আব, সাফিয়া, দিলাল, হুসনা, বুরকা, আওয়াফ ও মাশরাবা উম্মে ইবরাহীম**।

যাহোক, এখানে বনু নযীরের যুদ্ধের বর্ণনা সমাপ্ত হচ্ছে। আগামীতে ইনশাআল্লাহ্ অন্যান্য যুদ্ধের বর্ণনা করা হবে।

পাকিস্তানের আহমদীদের জন্য দোয়া অব্যাহত রাখুন। সেখানকার সার্বিক পরিস্থিতির উন্নতির জন্য দোয়ারত থাকুন। আল্লাহ তা'লা সেখানকার সার্বিক শান্তি ও নিরাপত্তার অবস্থায় উন্নতি দিন আর আহমদীদের নিজ নিরাপত্তার বেষ্টনীতে রাখুন। সারা বিশ্বের মুসলমানদের সার্বিক পরিস্থিতির জন্যও দোয়া করুন। তারাও যেন যুগ-ইমামকে মান্য করে নিজেদের গৌরব পুনরুদ্ধার করতে পারে। পৃথিবীতে যুদ্ধের যে সার্বিক পরিস্থিতি সৃষ্টি হচ্ছে তার জন্যও দোয়া করুন। পৃথিবীর পরিস্থিতি যেদিকে অগ্রসর হচ্ছে তা দেখে এখন তো মনে হচ্ছে, যুদ্ধ হবেই হবে। কিন্তু আল্লাহ তা'লা প্রত্যেক আহমদী ও প্রত্যেক নিষ্পাপকে যুদ্ধের মন্দ প্রভাব থেকে নিরাপদ রাখুন। (আমীন)

*** সমাপ্ত ***

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)